# রূপকল্পের ভেলায় শকরুদ্দিন-দীনদয়ালরা

অশোক মিত্র

যা বলতে চাইছি, তা বলতে গিয়ে প্রতিস্তব অন্বেষণ করি, রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে রূপকল্পে পৌঁছে যাই। তোমার উপমা তুমি, বুদ্ধি এই মন্তব্য করলেও আবেগের তাতে তৃপ্তি নেই, খুঁজে-খুঁজে মনের কন্দরে আঁকা চিত্ররূপের সঙ্গে মিলে যায় এমন শব্দগুঞ্জের সাহায্যে ছবি রচনা কেন সম্ভব হবে না? উপমাই কবিতা, কিংবা রূপকল্পই শিল্প-সর্বস্বতা, এমন উক্তি হয়ত একটু বাড়াবাড়ি, কিন্তু তাহলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না অবন ঠাকুরের কেন ছবি লেখার জন্য ভিতর থেকে এত তাগিদ ছিল।

যে-রূপকে বাঙ্ময় করে তুলতে চাই, কল্পনার সাহায্য নিয়ে তাকে তাই পরিস্ফুট করি। কখনো-কখনো উপমার চিত্রণে-ভাস্কর্যে এতটা আত্মহারা হই যে লক্ষ্য গৌণ হয়ে পড়ে, উপলক্ষই যেন প্রধান, একমাত্র তাকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্যই যেন এত শৈল্পিক আয়োজন। শিল্প কি তবে তার ব্রত থেকে, বৃত্তি থেকে স্বিরাচারী হল? তা-ও না। শিল্পের মাত্রান্তর ঘটল মাত্র। শিল্প প্রাক-নির্ধারিত পরিধি অতিক্রম করে অন্য-এক পরিভাষায় প্রবেশ করল। যে-মুহূর্তে তা ঘটল, চকিতে বিজলি আলো চোখেতে লাগাল ধাঁধা, এবং অতএব বুদ্ধিবৃত্তি হেরে ঢোল।

সৃষ্টি নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে পারে, চিত্রকল্পের সফলতা এই সোজা সত্যটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। যা একদা কুঙ্কুমের মতো ছিল, সূর্যের আলোয় তা কী করে রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো হয়ে যায় সেই জাদুর রহস্য ব্যাখ্যা করার প্রয়াসটাই স্বর্গ থেকে বিদায়ের কাছাকাছি ব্যাপার, বরঞ্চ ধার করা কথা ব্যবহার করে তখন বলা অনেক বেশি যথাযথ: দোহাই, বাক্যসংবরণ করো, ভালবাসো, উপভোগ করো।

কখনো-কখনো অবশ্য উপমা ও উপমেয় জায়গা বদল করে নেয়, শিল্পী-কবি-কর্মী যে-সামাজিক উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্টিকর্মে নিজেকে নিয়োজিত করেন, উপমা সেই উদ্দেশ্যকে আড়াল তো করেই না, আরো দ্রুততার সঙ্গে তার কাছে পৌঁছুতে সাহায্য করে। সোমনাথ হোরের 'তেভাগার ডায়েরি' যতবারই, যতক্ষণ ধরে নাড়াচাড়া করি, আমাকে অবাক করে। আজ থেকে প্রায় অর্ধ-শতাব্দী আগেকার ধূসর থেকে ধূসরতর হতে যাওয়া অধ্যায়। তখনো দেশ ভাগ হয়নি। গোটা বাংলা দেশ জুড়ে তেভাগা আন্দোলন, যে-মানুষগুলি শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে শোষণের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত, তাদের হঠাৎ সাহসের পেখম মেলে পৃথিবীতে দাপিয়ে যাওয়া, হয়ত

নিপীড়নের পরিমাপ প্রাত্যন্তিক নিষ্ঠুরতায় পৌঁছে গেলে এমনধারা সাহসের উদ্রেক হয়। এখন রূপকথার মতো মনে হয় তেভাগা আন্দোলনের সেই কাহিনী, গুলতি দিয়ে শিকার করে সে—রূপকথাকে মাটিতে নামানো হয়েছে বলে তরুণ সোমনাথ হোরের কাছেও হয়ত মনে হয়েছিল সাতচল্লিশ বছর আগেকার শীতের পৌষে পার্টির নির্দেশে উত্তরবঙ্গে আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্রে যখন তিনি পৌঁছুলেন। সোমনাথ হোর ছবি আঁকেন, স্কেচ করেন, কদাচিৎ-কখনো সাধারণ কালিতে আঁকা ছবি কাঠখোদাইয়ে রূপান্তরিত করেন। কৃষক সমিতির মানুষগুলিকে দেখছেন, তাদের দুঃখের কাহিনী—তাদের যুদ্ধের কাহিনী শুনছেন, তাদের আশে-পাশে যে-প্রকৃতি পরিবেশ, তাদের যে-গৃহস্থালি অনুভূতি দিয়ে তা গ্রহণ করছেন, ছবিতে তা ফুটিয়ে তুলছেন। কিন্তু চিত্রকরেরও বোধহয় মনের মধ্যে নাড়া দেয়, তাঁরও রূপকল্পের প্রয়োজন দেখা দেয়। সোমনাথ হোর তাঁর চিত্রণের চিত্ররূপ হিসেবে বেছে নিলেন নৈষ্ঠিক দিনলিপি, 'তেভাগার ডায়েরি'। ছবি আঁকছেন, আঁকিবুকি কাটছেন, চোখে-দেখা চরিত্রগুলিকে কালির টানে প্রাণবন্ত করে তুলছেন, কিন্তু পুরোপুরি তৃপ্তি নেই তাতে, ছবি-আঁকাকেও বিকল্প রূপ দিতে হবে, অতএব দিনলিপি।

সোমনাথ হোর লিখিয়ে নন, ছবি-আঁকিয়ে, খানিক-খানিক লিখে ছবির বিষয়বিন্যাসকে উপমায়িত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু লেখা কথাই ছবির বাড়া হয়ে গেল। ছবিকে ছাড়িয়েই চলে গেল যেন। যেমন, 'শীতের সকালে সাদা কাপড়ে জড়ানো মানুষগুলো ধান কাটছে, পাঁচজন সাতজন একসাথে। কোথাও একটি কালো গরু, কোথাও সাদা ছাগল ; সবাই প্রভাতী আলোর সাথে সাথে দিকে দিকে বেরিয়ে পড়েছে—প্রকৃতির কাছ থেকে আহার্যের সন্ধানে'। (পৃষ্ঠা ১৩-১৪) কিংবা যেমন 'এক জায়গায় কয়েকজন মুসলমান জোতদার চেষ্টা করলো মুসলমান আধিয়ার আর হিন্দু আধিয়ারের মধ্যে দাঙ্গা বাধাতে। তাদের বললো—হিন্দু আধিয়াররা যখন ধান কাটতে আসবে, তাদের ঠেকাও। তোমাদের আমরা বেশি ভাগ দেবো। তারা জবাব দিলো—ওসবে আমরা নেই। তখন জোতদাররা এক মেলায় গিয়ে মুসলমান ব্যবসায়ীদের বললো—তোমাদের ঘর আমরা পুড়িয়ে দেবো, ক্ষতি যা হবে তাও পূরণ করবো। তোমরা শুধু বলবে—হিন্দুরা তোমাদের দোকান পুড়িয়েছে। দোকানীরা করজোড়ে বললো—আমরা ওসবে নেই। বেশি জোর করেন তো আজই আমরা দোকানপাট তুলে চলে যাচ্ছি। জোতদাররা হতাশ হয়ে ফিরে গিয়ে আপোসের পথ ধরেছে'। (পৃষ্ঠা ১৯)

চিত্রকর ছবি আঁকেন, ছবি আঁকতে গিয়েও যা দৃষ্টান্তিত করেন তা যন্ত্র-নিষ্ঠ জ্ঞান, পরিমিতিবোধ, কোথায় কোন আঁচড় মানানসই হবে-কোথায় হবে না, কোন রঙ কতটা কোথায় ঢালা, রঙ বুলোনোর চেয়ে রঙ না-বুলোনোতেও কখনো-কখনো তাঁর প্রতিভার যথার্থ প্রকাশ। সোমনাথ হোর কস্মিনকালেও লেখক নন, সেই তরুণ বয়সেও ছিলেন না, কিন্তু এই দিনলিপি তো তাঁর চিত্রবিকল্প, তাই তাঁর স্থূলে ভুল নেই,

পরিমিতি উপচে পড়ছে, সংক্ষিপ্ততম বাক্যের বন্ধনে সমাজের অচেল সত্য ব্যক্ত হচ্ছে, নিসর্গও এই পরিমিতির অনুশাসনে নিজেকে উজাড় করে দিচ্ছে।

অবন ঠাকুর ছবি লিখতেন, 'তেভাগার ডায়েরি'তে সোমনাথ হোর কথা এঁকেছেন। কাদের কথা ? শঙ্করুদ্দিন-দীনদয়ালদের কথা, যাদের ছবি আঁকতে গিয়ে সেই ছবিকে গভীরতর চিত্ররূপ দিতে গিয়ে কথার খেয়াঘাটে তাঁর উঠে আসা। অন্য কাজ ফেলে এক মিনিট শুনুন সেই বৃত্তান্ত : 'বাড়ির বেড়া ভেঙে ভেঙে পড়ছে, ছাউনির খড় পচে গেছে, পরনে ছেঁড়া কাপড়, মেয়েরা সামনে বেরোতে পারে না কাপড়ের অভাবে, বছরের বহুদিনই দু'বেলা ভাত জোটে না। তবু আশ্চর্য মনের বল। জোতদার কত লোভ দেখালো, কত কাকুতি-মিনতি করলো। কিন্তু শঙ্করুদ্দিন কথার খেলাপ করলো না। মনে পড়ে, আমাদের নিঃস্বার্থ জাতীয় নেতা পণ্ডিত নেহরুর কথা। যখনই লাখ টাকার তোড়া হাতে পড়ে, ভুলে যান মজুতদারদের ফাঁসিতে লটকানোর শপথ, যখনই সোনায় রুপোয় ওজন করার কথা ওঠে, ভুলে যান দেশীয় রাজাদের উচ্ছেদের শপথ। সে যাই হোক, পণ্ডিতজী নিঃস্বার্থ, এ কথা স্বীকার করতেই হবে, কারণ তিনি মহান নেতা। আর শঙ্করুদ্দিন হয় দেশদ্রোহী কম্যুনিস্টদের দালাল, নয় কিষাণ গুণ্ডা, কারণ ঘুষে তার মন মজে না। দাবি করেই আদায় করতে চায়।' ( পৃষ্ঠা ৩৫-৩৬ )

সোমনাথ হোরের ছবিকে হারিয়ে দিয়েছে ছবির রূপকল্প। সোমনাথ হোরের লেখা কথার বুনোন। খেতে না-পাওয়া জিরাজিরে চেহারার এই আধিয়ারের দল, আর তাদের ঘরের বৌ-ঝিরা, 'তেভাগার ডায়েরি'র চিত্রণে নয়, লিখনে তাদের সমস্যাসুদ্ধু, তাদের সংগ্রামের নিভরোনো ওজস্‌সুদ্ধু মনের মধ্যে সেঁধিয়ে যায়। রূপকল্পের জাদুকে সনম্র, সবিস্ময় নমস্কার জানাই আমরা। সেই সঙ্গে সোমনাথ হোরের কবুলতির সঙ্গে ঠোঁটে ঠোঁট মিলিয়ে নিজেদের সঞ্চিত পাপের জন্য ক্ষমাভিক্ষা করি : 'দীনদয়াল শঙ্করুদ্দিন, তোমাদের দুঃখ আমরা বুঝি, কিন্তু প্রতিদিনের সেই দুঃখ ভোগ করি না। এই দুইয়ে ফারাক খুব বেশি। আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ তোমাদের কাছে শূন্যগর্ভ মনে হলে নালিশ করার মতো কিছু থাকবে না। কৈফিয়তও খাটবে না।' ( পৃষ্ঠা ১৩ )

তেমন-তেমন হৃদয়তা থাকলে শঙ্করুদ্দিন দীনদয়ালরাও চিত্রের বিষয় হতে পারে, চিত্র এবং চিত্রকল্পকে মিশিয়ে দিতে, মিলিয়ে দিতে পারে তারা। অর্থাৎ যিনি মেলানোর দায়িত্বে তাঁর যদি সেই হৃদয়তা থাকে। □

---

তেভাগার ডায়েরি। সোমনাথ হোর। স্বর্ণরেখা। প্রথম প্রকাশ : ১৯৯১। মূল্য : ২৫.০০ টাকা।